স্বাবলম্বী

স্বাবলম্বী ৪০ বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জানুয়ারী-মার্চ ২০২৩

আমাদের কথা

স্বাবলম্বী একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এর প্রতি সংখ্যায় যেমন উক্ত সময়কালের অন্তর্ভূক্ত দেশীয় ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার ঘোষিত বিশেষ দিবসগুলোকে লক্ষ্য রেখে তথ্য পরিবেশন করা হয় তেমনি পানি-পয়ঃনিষ্কাশন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, ঋণ প্রভৃতি বিষয়ক বিভিন্ন অগ্রগতি, নতুন নতুন পদক্ষেপ ও সচেতনতামূলক বিভিন্ন লেখা প্রকাশ করা হয়। ভার্ক সব সময়ই টেকসই সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে। তাই সকল প্রকল্পেই ভার্ক জনগণের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণকে টেকসই সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত বলেই বিশ্বাস করে।

স্বাবলম্বীর প্রতিটি সংখ্যায়ই আমরা চেষ্টা করে থাকি বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত সাধারণ জনগণের সচেতনতার সিদ্ধান্তমূলক তথ্য উপস্থাপন করতে ও প্রকল্প বিষয়ক বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সকলকে জানাতে। তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পালন করলেও আমরা মনে করি এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে এলেই ঐসব সুবিধা বঞ্চিত জনগণকে এই সেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব।

সম্পাদনা উপদেষ্টা
মো: ইয়াকুব হোসেন
মো: মাসুদ হাসান
রনদা প্রসাদ সাহা
মুস্তাফিজুর রশিদ মৃধা
মো: মাসুদ রায়হান

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
রিজওয়ান আহমেদ

কম্পোজিশনে
উম্মে সালমা

প্রকাশক
মো: ইয়াকুব হোসেন
নির্বাহী পরিচালক
ভার্ক।

VERC

সূচিপত্র:

আমাদের কথা ১
ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি ২

সাফল্য গাঁথা
গর্ভবতী মায়ের পাশে ভার্ক ৩
একজন অদম্য মোর্শেদা খাতুন ৪
সাথী বেগমের সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর জীবনের যাত্রা ৫
রোকসানার গল্প ৬
হেলেনা বেগম এখন স্বাবলম্বী ৭
ক্লিন ক্যাম্প ক্যাম্পেইন (CCC-PLTH) এপ্রোচ-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি গঠন ৮

আমাদের কর্মবার্তা
অপুষ্টি শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার শূন্যের কোটায় ৯
২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ১১
স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ১৩
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও ভার্কের অংশীদারিত্বে CREA প্রকল্পের সূচনা ১৫

পুরনো দিনের স্মৃতি
প্রসঙ্গ: জ্বালানী সাশ্রয় প্রকল্প ১৬

স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও প্রযুক্তি বার্তা
দেশে খর্বাকৃতির শিশু বাড়ছে ১৮
বিশ্বে নিরাপদ সুপেয় পানি পাচ্ছেন না ২৬% মানুষ: জাতিসংঘ ১৯
বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ক্যামেরা দ্য মিনিকা ২০
সরকারি কর্মকর্তাদের সম্বোধনে শুধুই 'স্যার' বলা কতটা ন্যায্য ২১

কচি হাতের কলম থেকে
খুকুমণি ২৪
ইচ্ছে ২৪

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি

মো: আজিম রানা, সহকারী পরিচালক, মাধবদী এরিয়া, ভার্ক

ভূমিকা: ভার্ক সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে টেকসই দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ভার্ক সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে টেকসই দারিদ্র্য নিরসনে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে। কারণ শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম। দারিদ্র্য বিমোচনের আওতা এবং এর বিশালতা অত্যন্ত ব্যাপক। এর সাথে জড়িত রয়েছে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত সমাজ, সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক মূল্যবোধ। এখন সেটা যদি টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদী না হয় তাহলে সামাজিক জীবনে এর সুফল পাওয়া যাবে না। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীকে টেকসই করতে হলে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত উদ্যোগ ও টেকসই কর্মসূচী নিয়ে কাজ করতে হবে। ভার্ক স্বাধীনতাত্তোর সময় থেকেই সরকারের পাশাপাশি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করে টেকসই দারিদ্র্য নিরসনে অদ্যবধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

টেকসই দারিদ্র্য নিরসনে সমন্বিত উন্নয়ন

দারিদ্র্য লাঘবে ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র অর্থায়নের অবদান বিষয়টি বহুল আলোচিত। এ বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। কিছু গবেষণার ভিত্তিতে বলা যায় যে, যারা দারিদ্র্য সীমার নিচে রয়ে গেছেন এদের অনেকেই ক্ষুদ্র ঋণ নিতে শুরু করার পূর্বের অবস্থা থেকে অনেক অগ্রগতি করেছে। সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি কারিগরি সহায়তা, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, নিরাপদ পানি ও উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা ইত্যাদি কার্যক্রম একই সাথে পরিচালনা করা জরুরি। দারিদ্র্য বহুমুখী। সুশিক্ষার অভাব ও স্বাস্থ্য সমস্যা অতি গুরুত্বপূর্ণ দুইটি প্রতিবন্ধকতা। কাজেই এ দুইটি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে যদি বিভিন্ন অনুষঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করা যায় তাহলে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে। একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া ছাড়া টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। শুধুমাত্র ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে এত সমস্যার সমাধান সম্ভব না। ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে অর্থকারী কর্মকাণ্ডে উৎসাহ প্রদান করা গেলেও অনেকেই ব্যর্থ হচ্ছেন। এই ব্যর্থতারও অন্যতম কারণ হলো শিক্ষার অভাব ও পরিবেশ অনুকূলে না থাকা। সাম্প্রতিক করোনাকালে ও ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে আরও কিছু লোক নতুন করে দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে গিয়েছে। অনেকেই তাদের পূর্বের পেশা পরিবর্তন করে নিম্নগামী পেশায় যুক্ত হয়েছেন। তাদের পুনরায় দারিদ্র্য সীমা থেকে বের করতে প্রয়োজন হবে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে চ্যালেনজিংও বটে।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক ক্ষুদ্রঋণ: গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম। গ্রামের মানুষ এখন ২০-৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সহায়তা পায়। এই অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করে সময়মতো পরিশোধ করতে পারছে গ্রামের মানুষ। এখন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় বীমা সেবা ও রেমিটেন্স সেবা হাতের কাছেই পাচ্ছে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ। তাই আমরা বলতে পারি আগামী দিনে গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক হবে ক্ষুদ্রঋণ।

ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রমে বিশ্বাস করে। ভার্ক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও দারিদ্র্য বিমোচনে দেশি বিদেশি দাতা গোষ্ঠীর সহায়তায় দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এর জন্মলগ্ন থেকে অদ্যবধি কাজ করে যাচ্ছে।

গর্ভবতী মায়ের পাশে ভার্ক

পাজর ভাঙ্গা শাখার গাংচিল মহিলা সমিতির সদস্য মোছা: জেসমিন বেগম, স্বামী মো: সুলতান মিয়ার মেয়ে মোছা: সাদিয়া বেগম, বয়স: ২০ বছর। সাদিয়া একজন গর্ভবতী। গর্ভকালীন সময়ে সাদিয়া মায়ের বাসায় অবস্থান করেন। সাদিয়াকে ৩ মাস গর্ভকালীন সময়ে প্রথম চেক-আপ করা হয়। সাদিয়ার রক্তচাপ, ওজন, ডায়াবেটিস, রক্ত শূন্যতা ইত্যাদি পরিমাপ করা হয়। ১ম গর্ভকালীন চেক-আপে সাদিয়ার তেমন কোন শারীরিক সমস্যা ছিলো না। তাকে প্রাথমিক সেবা দেয়ার পাশাপাশি গর্ভকালীন সময়ের বিপদ চিহ্ন সম্পর্কে অবহিত করা হয়। যেমন, ঘনঘন মাথা ঘোরা, চোখে ঝাপসা দেখা, রক্তক্ষরণ হওয়া, তিন দিনের বেশী সময় ধরে জ্বর হওয়া, প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হওয়া ইত্যাদি। এর পাশাপাশি গর্ভকালীন সময়ে খাদ্য ও পুষ্টি নিয়েও সচেতন করা হয়। বরাবরের মতো সাদিয়াকে ২য় ও ৩য় চেক-আপ করা হয়। ৩য় চেক-আপের পর হঠাৎ করে তার চোখ মুখ ফুলে যায় এবং মাথা ঝিমঝিম করে, চোখে ঝাপসা দেখে। ফোনের মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তার মা সমস্যার কথা বলে। দ্রুত সাদিয়ার রক্তচাপ পরিমাপ করে দেখা যায় স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশী যা প্রি-একলামেসিয়ার লক্ষণ। সাদিয়ার পরিবারকে এ বিষয়ে জানানো হয় এবং দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সাদিয়া সুস্থ হয়ে কিছুদিন পর নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে সন্তান প্রসব করে। সঠিক সময়ে সঠিক দিক নির্দেশনা, রোগ নির্ণয় এবং সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত পাওয়ায় সাদিয়ার পরিবার অনেক আনন্দিত হয়।

প্রতিবেদক,
মাহফুজা আক্তার মিতু
কর্মসূচী সংগঠক (স্বাস্থ্য)
ভার্ক, মান্দা।

একজন অদম্য মোর্শেদা খাতুন

মোর্শেদা খাতুন একজন নারী উদ্যোক্তা– স্বামী: আনাল হক, গ্রাম: বেলালদহ, উপজেলা: মান্দা, জেলা: নওগাঁ। ২০০৭ সালে মাত্র ৩,০০,০০০ টাকা নিয়ে মোর্শেদা ও তার স্বামী তুলা কেনাবেচার ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু তাতে তেমন কোন লাভ না আসার ফলে, ঝুট কিনে নিজেই তুলা উৎপাদনের ব্যবসা করবেন বলে মনস্থির করেন। মোর্শেদা ২০০৫ সাল থেকে ভার্ক-এর সদস্য। প্রথমে ৬,০০০ টাকা থেকে শুরু করে বর্তমানে ১,৭০,০০০ টাকা ঋণ সফলতার সঙ্গে চালাচ্ছেন। তার আজকের এই সফলতা একদিনে আসেনি। তিনি নিজে এক সময় তুলার মিলে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। ভার্কের ঋণ-এর সাথে নিজের সঞ্চয় যুক্ত করে, পরিশ্রম ও অদম্য ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমে তার আজকের এই সফলতা। বাধাও এসেছে অনেক। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আগুনে তার মিলসহ সমস্ত কাঁচামাল (ঝুট) পুড়ে যায়। তার স্বামী সেই সময় বিদেশে থাকায় তাকে একাই প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করতে হয়েছে। সেই সময়ে ভার্ক তার পাশে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য সে ভার্কের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। তার এই প্রকল্পের আয় থেকেই স্বামীকে বিদেশে পাঠিয়েছেন। বর্তমানে তার স্বামী সৌদি প্রবাসী। ১ ছেলে ও ১ মেয়ে নিয়ে সুখের সংসার মোর্শেদার। তিনি স্বপ্ন দেখেন সন্তানদের মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলবেন। তার তুলা উৎপাদনের মিলের কাঁচামাল হিসেবে গার্মেন্টস-এর ঝুট ব্যবহৃত হয়, যা তিনি ঢাকা থেকে ক্রয় করে থাকেন। তার এই প্রচেষ্টার ফলে ৮ জন মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। এর মধ্যে ২ জন নারী ও ৬ জন পুরুষ। মার্কেটিং-এর দিকটি তিনি নিজেই দেখাশোনা করেন। যেমন- মাল ডেলিভারিসহ পাওনা আদায়। এক ট্রাক তুলার মূল্য ২,৫০,০০০ টাকা যা থেকে সকল খরচ বাদ দিয়ে লাভ থাকে ২০,০০০ টাকা। মাসে সর্বোচ্চ ২ ট্রাক তুলা উৎপাদন করা সম্ভব হয়। সে হিসেবে মাসে আয় ৪০,০০০ টাকা। বর্তমান সময়ে হয়তো এটা আহামরি আয় নয়। কিন্তু একজন স্বল্প শিক্ষিত মানুষ হিসেবে ৮ জন মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিসহ নিজে কিছু করতে পারার আনন্দ ও প্রশান্তির কোন অর্থ মূল্য দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। তার আজকের এই অগ্রগতি ও বিপদে পাশে থাকার কারণে তিনি ভার্কের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। তার মতে, ভার্কের মতো একটি ভালো সংস্থা পাশে ছিলো বলেই একজন নারী হয়ে আমি এত কিছু করার সাহস পেয়েছি।

প্রতিবেদক, মো: আরিফুজ্জান
সহকারী পরিচালক, ভার্ক, মান্দা।

সাথী বেগমের সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর জীবনের যাত্রা

মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের প্রধানের চর উত্তরপাড়া নামক একটি গ্রামে বাস করেন সাথী বেগম নামের এক সাহসী নারী। সাথী বেগম ভার্ক সংস্থার আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্পের উঠান বৈঠকের একজন নিয়মিত সদস্য। এই অঞ্চলের পানির উৎসগুলিতে আর্সেনিক দূষণের মাত্রা কোথাও কোথাও বিপদসীমার বেশি। ভার্কের আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্পের দ্বারা পরিচালিত উঠান বৈঠকের মাধ্যমে অনুপ্রাণীত হয়ে সাথী বেগম নিজেকে পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন যা তার জীবনকে বদলে দিতে সহায়তা করছে।

ভার্ক-এর আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প দ্বারা আয়োজিত উঠান বৈঠকে যোগদানের পর, সাথী বেগম নিরাপদ পানি সংগ্রহের গুরুত্ব সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি অর্জন করেন। তিনি আর্সেনিক-দূষিত পানির ক্ষতিকারক প্রভাব এবং তার পরিবারের মঙ্গল নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে শিখেছেন। তিনি নিরাপদ পানি সংগ্রহের ধাপগুলো সম্পর্কে অবহিত হন যা তিনি আগে জানতেন না এবং সেই ধাপগুলো অনুসরণ করে তার পরিবারের জন্য বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বর্তমানে তার পরিবার আর্সেনিক মুক্ত এবং নিরাপদ পানির প্রবেশাধিকার পেয়েছে এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে মুক্ত হয়েছে।

আগে সাথী বেগম ও তার পরিবারের সদস্যরা পাশের বাড়ির একটি অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করতেন। উঠান বৈঠকের মাধ্যমে তিনি স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহারের তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন যা রোগের বিস্তাররোধ করতে এবং একটি পরিষ্কার পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়তা করে। নাসিমার বাড়িতে একটি স্যানিটারি ল্যাট্রিন থাকলেও তা ব্যবহার অনুপযোগী ছিল। বর্তমানে সে ল্যাট্রিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ব্যবহার করছেন এবং তার এলাকায় যারা অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করছেন তাদেরকে স্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করে সবার জন্য স্বাস্থ্যবিধি এবং মর্যাদা প্রচারে সহায়তা করছেন।

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সাথী বেগম হাত ধোয়ার গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস এবং রোগের সংক্রমণ রোধে এর ভূমিকা সম্পর্কেও জেনেছেন। তিনি তার বাড়িতে একটি হাত ধোয়ার ডিভাইস স্থাপন করে তার পরিবারের সদস্যদের নিয়মিত হাত ধোয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত করেছেন বিশেষ করে খাবারের আগে এবং ল্যাট্রিন ব্যবহার করার পরে। নাসিমা উদাহরণের নেতৃত্বে, অধ্যবসায়ভাবে দিনে পাঁচবার তার হাত ধোয়া এবং তার পরিবারের সদস্যদেরকে একই কাজ করতে উৎসাহিত করছেন।

সময়ের সাথে সাথে সাথী বেগমের প্রচেষ্টা ইতিবাচক ফল পেতে শুরু করে। তার পরিবার তাদের এবং সুস্থতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি অনুভব করেছে। আগে জলবাহিত রোগ ছিলো ঘন ঘন ঘটনা কিন্তু এখন তা অতীতের বিষয়। তার প্রতিবেশিরা সাথী বেগমের পরিবারে যে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে তা লক্ষ্য করে অনেকেই তাকে দেখে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন।

নিরাপদ পানি সংগ্রহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনের প্রচারে সাথী বেগম একজন অনুপ্রাণিত ব্যক্তি হিসেবে তার এলাকায় পরিচিতি লাভ করেছেন এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে অনেকেই এখন অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। তিনি সক্রিয়ভাবে নিজে এখন ভার্কের আর্সেনিক প্রকল্পের প্রতিটি উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন এবং অন্যদের সাথে তার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা শেয়ার করে স্বাস্থ্যবার্তাগুলো গ্রহণ করতে সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। সাথী বেগম তার গ্রামের জন্য একটি উদাহরণ হয়ে উঠেছেন। উন্নতির জন্য একটি স্বাস্থ্যকর জীবন ধারা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করার পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তার গল্প অন্যদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

প্রতিবেদক,
তৌহিদুর রহমান
মনিটরিং এন্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার
আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প (লট-৫)
ভার্ক, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।

রোকসানার গল্প

ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার তারানগর ইউনিয়নে বটতলী গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে রোকসানা বেগম জন্মগ্রহণ করেন এবং এই গ্রামের মো: পইলন মিয়া ও ছফুরা খাতুনের ছেলে মো: আনোয়ার হোসেনের সাথে রোকসানা বেগমের বিয়ে হয়। তার স্বামী একজন কৃষক ছিলেন। জমিজমা বলতে কিছুই ছিল না। অন্যের জমি বর্গা নিয়ে কোন রকমে তাদের সংসার চলতো। বছর ঘুরতেই তাদের কোল আলোকিত করে আসে এক পুত্র সন্তান। সংসারের খরচ বাড়তে থাকে। অধিকাংশ সময় সংসার খরচের জন্য টাকা জোগাড় করতে ব্যর্থ হন এবং আত্মীয়-স্বজনের কাছে সাহায্যের জন্য ধরণা দিতে হতো। এভাবে আর্থিক অনটনের মধ্যে জীবন যাপনের এক সময় রোকসানা বেগম ২০১২ সালে ২৫ বছর বয়সে তার নিজ গ্রামের পাশের হাজেরার বাড়িতে ভার্ক-এর কেন্দ্রের সদস্য পদ লাভ করেন। প্রথমে সে সঞ্চয় জমাতে থাকেন। বেশ কিছুদিন সময় পার হয়। রোকসানা তার স্বামীর সাথে পরামর্শ করে ব্যবসা করতে উৎসাহিত হয় এবং ভার্ক অফিস থেকে ১ম দফায় দশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে তা দিয়ে তারা নিজের উদ্যোগে স্বামী ও ছেলেকে নিয়ে তামার গহনা তৈরি করতে শুরু করেন। শুরু হয় তাদের ব্যবসা। এভাবে বেশ কয়েক দফা ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসার পুঁজি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ব্যবসায়ে সফলতা আসে। তামার গহনার ব্যবসা আস্তে আস্তে ভালো হতে থাকে। সেখান থেকে রোকসানা বেগম অল্প কিছু জমি কিনে বাড়ি তৈরি করেন। পাশাপাশি কৃষি জমি কিনে ফসলও ফলাতে থাকেন। এক সময় তার পরিবারে স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। তার কর্মগুণ আজ ব্যবসায়ীদের নিকট আদর্শ ও প্রেরণার জ্বলন্ত উদাহরণ। তিনি প্রমাণ করেছেন পরিশ্রম তাকে এই শীর্ষ অবস্থানে এনেছে। তিনি নামমাত্র পুঁজি নিয়ে ব্যবসায়ের মাধ্যমে বর্তমানে তার জীবন সুন্দরভাবে অতিবাহিত করছেন। তার এই কর্মকাণ্ড সৃজনশীল উদ্যোক্তাদেরকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করবে ।

প্রতিবেদক,
মর্জিনা খাতুন, শাখা ব্যবস্থাপক
ভার্ক, কলাতিয়া।

হেলেনা বেগম এখন স্বাবলম্বী

ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) কালিয়াকৈর এরিয়ার কালামপুর শাখার অন্তর্গত বরাটিয়া গ্রামের টগর মহিলা সমিতি কোড (০২৮) ১৪.০১.২০১২ইং তারিখে মোসা: হেলেনা বেগম কোড-(১২৪৭) সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। সে প্রতি বছর ভার্ক থেকে ঋণ নিয়ে সফলতার সাথে তার স্বামীর সাথে ব্যবসা করে সুখে শান্তিতে তার পরিবার নিয়ে বসবাস করে আসছেন। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ এর জন্য তার ব্যবসা দীর্ঘ দিন বন্ধ ছিল। যার ফলে তার ব্যাপক ক্ষতি হয়। তার ব্যবসা পুনরায় চালু করার জন্য ভার্ক কালামপুর শাখা হতে এমডিপি খাত থেকে ২৪.০২.২২ইং তারিখে কাঁচামালের ব্যবসা প্রকল্পে ২,১০,০০০.০০ টাকা ১৮টি কিস্তিতে পরিশোধের জন্য ঋণ দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে তার ব্যবসার উন্নতি হতে থাকে। বর্তমানে সে তার পরিবার নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করছে।

প্রতিবেদক,
কামরুল হাসান
ভার্ক, কালামপুর।

ক্লিন ক্যাম্প ক্যাম্পেইন (CCC-PLTH) এপ্রোচ-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি গঠন

আমার নাম ফাতেমা খাতুন, আমি ক্যাম্প 8W এর ব্লক A, সাব ব্লক A-64 এ থাকি। বাংলাদেশে আসার আগে আমি মায়ানমারের পইরা বাজার এলাকায় থাকতাম। আমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা নয় জন। আমি ও আমার পরিবার প্রাণের ভয়ে ২০১৭ সালে বাংলাদেশে চলে আসি ও ক্যাম্পে থাকতে শুরু করি। তখন ছিল না কোন ঘর, পানি, ল্যাট্রিন, ময়লা আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা এবং চিকিৎসার সুব্যবস্থা। তাই যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলতাম এবং নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন না থাকার কারণে যেখানে সেখানে পায়খানা করতাম, অনিরাপদ পানি পান এবং ব্যবহার করতাম যার কারণে আমি ও আমার পরিবার ডায়রিয়াজনিত এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হই। এমন সময়ে আমাদের ক্যাম্পে কিছু কিছু এনজিও বিভিন্নভাবে কাজ করতে শুরু করে। পানি, ল্যাট্রিন এসব নিয়ে কাজ করতে এক এনজিও আসে। তাদের কাছে আমরা আমাদের উক্ত সমস্যার কথা বলি কিন্তু তারা যে ল্যাট্রিনগুলো দিয়েছে তা অনেক দূরে এবং পাহাড়ের উপরে তাই আমি ও আমার পরিবারের সদস্যদের ল্যাট্রিনে যেতে অনেক সমস্যা হয়। দূরত্বের কারণে ল্যাট্রিনে যেতে হলে বোরখা পরে ও রাস্তার মধ্য দিয়ে যেতে হয় এমনকি বর্ষাকালে ল্যাট্রিনে যেতে পারতাম না– অনেক সমস্যা হতো। এরপর ভার্ক এনজিও পানি, ল্যাট্রিন আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কাজ করতে আসে। ভার্ক এনজিও-এর পক্ষ থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে ফাতেমা জিন্নাত হীরা আপা আমাদের ব্লকে কাজ করছে। হীরা আপা আমাদের কাছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে বিভিন্ন মিটিং করে। তার মধ্যে ব্লকের অনেক লোকজন অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্লিন ক্যাম্প ক্যাম্পেইন (CCC-PLTH)-এর সাথে পরিচিত হই। সেখানে আপা আমাদের নিজেদের ব্লকে সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি জানাই যে, আমাদের পরিবারসহ আশেপাশের পাঁচ পরিবারের জন্য একটি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন খুবই প্রয়োজন। তাছাড়া আমাদের আশেপাশে ময়লা আবর্জনা পৃথকীকরণ করে রাখার নির্দিষ্ট কোন জায়গা নেই। তখন বিষয়টি আপা নোট করে নেন এবং আশ্বাস দেন যে, বিষয়টি অফিসে জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। পরবর্তীতে আপা আমাদের সাব ব্লকে এসে আমার পরিবারসহ আশেপাশের সবাইকে নিয়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সবার সুযোগ সুবিধা এবং মতামতের ভিত্তিতে আমাদের জন্য পানি, ল্যাট্রিন, হাউজহোল্ড বিন এবং কমিউনাল বিনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এসব রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্লক-এর মানুষের নিরাপদ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ব্লকের মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হওয়া খুব দরকার। ক্লিন ক্যাম্প ক্যাম্পেইন (CCC-PLTH) এপ্রোচ-এর মাধ্যমে কিভাবে মানুষ একত্রিত হয়ে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই চিহ্নিত করে এবং সেই সমস্যা সমাধান করা যায় সে বিষয়ে আমি অবগত হই। আমি এই এপ্রোচ-এর মাধ্যমে শিখে বর্তমানে ঘরের পানি, ল্যাট্রিন, হাত ধোয়া, ময়লা ফেলার বিন এসব কিছু নিজে দেখাশোনা করি এবং খারাপ কিছু দেখলেই তা আমার প্রতিবেশীদের ডেকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে চলার জন্য পরামর্শ দেই। এভাবে আমি আমার পরিবারসহ আশেপাশের পরিবারগুলো স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করি এবং ময়লা আবর্জনা পৃথকীকরণ করে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলি। ভার্ক-এর স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক মিটিং-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমি আমার পরিবারসহ সচেতন হই ও আশেপাশের সকল

পরিবারকেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে মিটিং-এর মাধ্যমে সচেতন করি। এছাড়া ভার্ক-এর ভলান্টিয়ার ও আপার সাথে Participatory Monitoring Tools এর খাতাগুলো নিয়ে ব্লকের ঘরগুলোতে যাই ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করি। ভার্ককে আমার এবং সংশ্লিষ্ট ব্লকের ব্যবহারকারী লোকজনদের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ এবং শুকরিয়া জানাচ্ছি এভাবে ক্লিন ক্যাম্প ক্যাম্পেইন (CCC-PLTH) এপ্রোচ-এর মাধ্যমে আমাদের মধ্যে সঠিক স্বাস্থ্যবিধি ও আচরণবিধি নিয়ে কাজ করার জন্য এবং প্রয়োজনমত পানি, ল্যাট্রিন, হাউজহোল্ড বিন এবং কমিউনাল বিনের ব্যবস্থা করার জন্য। যা আমাকে সঠিক নিয়মে স্বাস্থ্যবিধি পালনের উপকারিতা সম্পর্কে অবগত করেছে ও আমাকে একজন সচেতন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছে।

প্রতিবেদক, সোমা দে, হাইজিন ব্যবস্থাপক
প্রোভিশন অফ লাইফ সেভিং ওয়াশ সার্ভিসেস
ভার্ক, উখিয়া।

অপুষ্টি শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার শূন্যের কোটায়

স্বাস্থ্য খাতের সাথে ভার্ক-এর 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রমের সমন্বয়ের ফলে লক্ষণপুর ইউনিয়নে অপুষ্টি শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে। পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহায়তায় ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)-এর বাস্তবায়নে লক্ষণপুর ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রমের মধ্যে গর্ভবতী মায়ের পিএনসি এএনসি সেবা ও অপুষ্টি শিশু চিহ্নিত করে তাদের সেবা নিশ্চিত করা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একটি গবেষণায় দেখা যায় আমাদের দেশে বর্তমানে প্রতি লাখ জীবিত শিশু জন্মে, তারমধ্যে মাতৃমৃত্যু ১৬৫ জন, যা ২০০৯ সালে ছিল ২৫৯ জন। গত ১০ বছরে মাতৃমৃত্যু হার কমেছে, প্রতিলাখে জীবিত শিশু জন্মে প্রায় ৯৪ জন। যদিও গত ১০ বছরের পরিসংখ্যানে কিছুটা উন্নতি দেখা যাচ্ছে এবং বিগত ৫০ বছরেও মাতৃমৃত্যু হার কমেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসের দিকে। ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। সরকারের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যু প্রতি হাজারে ৫০ জনের নিচে নামিয়ে আনা। এই মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে দেশের বেসরকারি সংস্থা ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের। সরকারের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন জেলায় বেসরকারি সংস্থাগুলো বিভিন্নভাবে তাদের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তেমন একটি সংস্থা ভার্ক, যা গত ১৯৭৭ সাল থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় তাদের স্বাস্থ্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে 'সমৃদ্ধি' স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম। কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার লক্ষণপুর ইউনিয়নে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম গত ২০১৪ সাল থেকে সরকারের পাশাপাশি উক্ত ইউনিয়নে কাজ করছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে গর্ভবতী মায়েদের সেবার মাধ্যমে মাতৃ মৃত্যুর হার কমানো ও শিশুর পুষ্টিহীনতা রোধ কমানো। এই সেবাগুলো

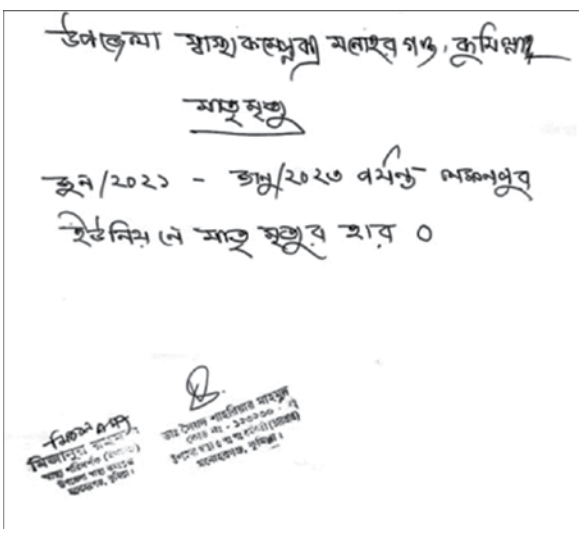
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা

মাতৃ মৃত্যু

জুন/২০২১ - জানু/২০২৩ পর্যন্ত লক্ষণপুর ইউনিয়নে মাতৃ মৃত্যুর হার ০

বিভিন্ন মাধ্যমে দিয়ে থাকে, যেমন স্ট্যাটিক ক্লিনিক-এর মাধ্যমে একজন মেডিকেল এসিস্টেন্ট সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত গর্ভবতী মায়েদের চেক-আপ ও অপুষ্টি শিশু রোধে ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রতিমাসে ৪ দিন করে ওয়ার্ড পর্যায়ে এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা উপরোক্ত সেবা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও দেড় মাস পর পর বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে সেবা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। উভয় প্রচেষ্টার ফলে লক্ষণপুর ইউনিয়নে বর্তমানে জুন,

অপুষ্টি শিশুর ছবি

২০২১ইং থেকে জানুয়ারি, ২০২৩ইং পর্যন্ত লক্ষণপুর ইউনিয়নে মনোহরগঞ্জ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা তথ্য মতে মাতৃ মৃত্যু শূন্য এবং অপুষ্টি শিশু ১ জন।

এ বিষয়ে মনোহরগঞ্জ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার সৈয়দ শারিয়ার মাহমুদ বলেন মনোহরগঞ্জ উপজেলার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে লক্ষণপুর ইউনিয়ন। এর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অন্যান্য ইউনিয়নের চেয়ে একটু বেশি। এখানকার বেশির ভাগ মানুষ লেখা-পড়ায় অজ্ঞ। এখানকার মানুষেরা অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী দ্বারা গর্ভবতী মায়েদের প্রসব করান। ফলে বিগত বছরগুলোতে মাতৃ মৃত্যুর হার অনেক বেশি ছিল এবং অপুষ্টি শিশুর সংখ্যাও ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বর্তমানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ভার্কের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রমের নিবিড় তত্ত্বাবধানের ফলে লক্ষণপুর ইউনিয়নে অপুষ্টি শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে। এ জন্য ভার্ক নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। আমি আপনাদের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

এ বিষয়ে লক্ষণপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়াম্যান মহিন উদ্দিন চৌধুরী বলেন, "আমার ইউনিয়নে ভার্ক যে সমস্ত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তা আল্লাহর বড় একটি নিয়ামত। আপনারা যে ভাবে গর্ভবতী মায়েদের এএনসি, পিএনসি সেবা এবং অপুষ্টি শিশু রোধ এবং সেবার পাশাপাশি বিনামূল্যে গর্ভবতী মায়েদের ঔষধ, শিশুদের পুষ্টিকণা প্রদান করে থাকেন যা আমার লক্ষণপুর ইউনিয়নের জন্য বড় পাওয়া। ফলে আজকে মাতৃ মৃত্যু ও অপুষ্টিশিশু শূন্যের কোটায় নেমে এসেছে। এই কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকারের জন্য একটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে। এছাড়া তিনি বলেন আমার ইউনিয়নে প্রতি বছরে আপনারা যে ছানি রোগী অপারেশন করে থাকেন এই ঋণ

শোধ করার মত আমাদের ভাষা নাই। এই ভাবে যদি সকল ইউনিয়নে আমরা এই সেবা কার্যক্রম চালাতে পারি তাহলে দেশ থেকে এক সময় মাতৃ মৃত্যুর কথা আমাদের কানে আসবে না। আমি আপনাদের কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি। এই বিষয়ে সমৃদ্ধির প্রকল্প সমন্বয়কারী বলেন মাতৃ মৃত্যু সমাজের জন্য অনেক কষ্টের পরিবারের জন্য বেদনাদায়ক এটার ফলে একটি পরিবার ভেঙ্গে পড়তে পারে সমাজে একটি ভালো মা হারিয়ে যেতে পারে আমরা যদি সময়মত পিএনসি এবং এনসি সেবাগুলো নিতে পারি, নিয়মিত ঔষধ সেবন করতে পারি তাহলে আমাদের সমাজে মাতৃ মৃত্যু হার থাকবে না এবং অপুষ্টি শিশু জন্মগ্রহণ করবেনা। লক্ষণপুর ইউনিয়নে যে শিশুটি অপুষ্টি আছে তার নাম সাইফা তুন মুনতাহা, পিতার নাম: সাহাদত, গ্রাম: বেতিয়াপাড়া। শিশুর বয়স ১ বছর তার মুয়াক ১১ এর নিচে ওজন ২ কেজি ৯শ গ্রাম অর্থাৎ তার থাকার কথা ১১.৫ এর উপরে ওজন কমপক্ষে ৭ কেজি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত, যা মারাত্মক অপুষ্টি শিশু। এটার পিছনে কারণ হচ্ছে বাবু যখন পেটে এসেছে সে সময়মতো পিএনসি ও এএনসি সেবাগুলো নিতে পারেনি, পেটে থাকা অবস্থায় শিশু বিকাশে যে কাজগুলো করার দরকার তা করেনি যার কারনে শিশুটি অপুষ্টি হয়েছে। বর্তমানে সকলের নিবিড় তত্ত্বাবধানে আছে। আমরা যদি এই সমস্ত শিশুদের সঠিক সময়ে নিয়মিতভাবে পুষ্টি কণা খাওয়াতে পারি তাহলে তারা সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। তাই ভার্ক-এর সেবা কার্যক্রম সকলের নিয়মিত গ্রহণ করা উচিৎ। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে লক্ষণপুর ইউনিয়নে মাতৃ মৃত্যু ও অপুষ্টি শিশু যেন জন্মগ্রহণ না করে তা নিশ্চিত করা।

প্রতিবেদক, মোঃ শাহারুল ইসলাম
প্রকল্প সমন্বয়কারী
সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি, ভার্ক।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। মায়ের ভাষাকে রক্ষার জন্য রাজপথে আন্দোলন হয়। পাকিস্তানি বাহিনীর গুলিতে প্রাণ দান করে বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা। সালাম-বরকত-রফিক-শফিক-জব্বারসহ আরও কত নাম না-জানা সে সব শহীদের আত্মত্যাগে আমরা ফিরে পাই আমাদের প্রাণের প্রিয় ভাষা বাংলা।

জাতিসংঘের স্বীকৃতির ফলে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে সারাবিশ্বে। দিনটি ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের ইউনেসকোর ৩০তম অধিবেশনে ইউনেসকোর সভায় একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব পাস হয়। ফলে পৃথিবীর সব ভাষাভাষীর কাছে একটি উল্লেখযোগ্য দিন হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারি স্বীকৃতি পায়। বিশ্বের দরবারে বাংলাভাষা লাভ করে বিশেষ মর্যাদা। ঠিক পরের বছর ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে পৃথিবীর ১৮৮টি দেশে এদিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন শুরু হয়। মহান ভাষা আন্দোলনের দিন হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারি প্রতি বছরই মর্যাদার সঙ্গে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে পালিত হয়ে আসছে। ভার্ক প্রতিবারের ন্যায় এবারও যথাযথ মর্যাদায় ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করে।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল

১) জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা;

২) শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ;

৩) চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা; এবং

৪) শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা।

জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে সংস্থার প্রধান কার্যালয় এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ১০০টি শাখা অফিস ও ১৪টি প্রকল্প অফিসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ

ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সংস্থার প্রধান কার্যালয় হতে সাভার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ১০০টি শাখা অফিস ও ১৪টি প্রকল্প অফিস হতে উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে স্থানীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

দিবসটি উপলক্ষ্যে ভার্কের ঋণ কার্যক্রমের উদ্বৃত্ত আয় হতে সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত ৮৫টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে এবং পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত ৩১টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিশুদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে প্রত্যেক প্রতিযোগী শিশুর মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীদের নিয়ে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

সংস্থার প্রধান কার্যালয় এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ১০০টি শাখা অফিস ও ১৪টি প্রকল্প অফিসের স্টাফদের নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় ভাষা আন্দোলনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুসহ সকল ভাষা শহিদ ও ভাষা সৈনিকদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া জাতিসংঘ হতে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণার প্রেক্ষাপট নিয়েও আলোচনা করা হয়। আলোচনা সভায় ভার্কের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক,
খন্দোকার হাসান আল বান্না
উপ-পরিচালক, মাইক্রোফাইন্যান্স
ভার্ক।

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬শে মার্চ জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে (কালরাত) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করে। ২৫ মার্চ রাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে এক তার বার্তায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে এম এ হান্নান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারি প্রকাশিত এক সরকারি প্রজ্ঞাপনে এই দিনটিকে বাংলাদেশে জাতীয় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপনের ঘোষণা প্রদান করা হয়।

ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) একটি জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে তার প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস যথাযথ তাৎপর্য বজায় রেখে পালন করে আসছে। বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবছরও গুরুত্বের সাথে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করেছে।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল

১) সংস্থার প্রধান কার্যালয় আলোকসজ্জাকরণ;
২) জাতীয় ও স্থানীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ; এবং
৩) এরিয়াভিত্তিক স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনা।

সংস্থার প্রধান কার্যালয় আলোকসজ্জাকরণ

দিবসটি উপলক্ষ্যে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ড্রপ - ডাউন ব্যানার টাঙ্গানো হয় এবং বিগত ১৭.০৩.২০২৩ তারিখে জাতির জনকের জন্মবার্ষিকী হতে ২৬.০৩.২০২৩ তারিখ স্বাধীনতা দিবস পর্যন্ত একটানা আলোকসজ্জা করা হয়। উল্লেখ্য, ২৫ মার্চ কালোরাত্রি থাকায় ঐদিন আলোকসজ্জা বন্ধ রাখা হয়।

জাতীয় ও স্থানীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ

ভার্ক প্রধান কার্যালয় হতে সাভার এনজিও পরিষদের সাথে সমন্বয় করে স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত বীর শহীদদের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা জানাতে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়া শাখা ও এরিয়া কার্যালয় হতে উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে স্থানীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এরিয়া ভিত্তিক স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনা

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বিগত ২৬.০৩.২০২৩ তারিখে একই দিনে ভার্কের ঋণ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত ১৭টি এরিয়ার মধ্যে পুরাতন ১৬টি এরিয়ায় দিনব্যাপী মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ক্যাম্প উদ্বোধন করা হয়। প্রতিটি ক্যাম্প গাইনী ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ২জন ডাক্তার স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেন এবং সেবা গ্রহণকারী সকল রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা হয়। সকাল ৯টা হতে শুরু করে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। এলাকার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় এবং জনগণ কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণে স্বাস্থ্য ক্যাম্পে রোগীর উপস্থিতি অনেক বেশী ছিল। প্রতিটি ক্যাম্পের দায়িত্বরত ডাক্তারগণ আন্তরিকতার সাথে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছেন এবং সেবা ও ঔষধ গ্রহণ করে রোগীরাও তাদের সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন। ক্যাম্প শুরুর পূর্বেই এক সপ্তাহ যাবৎ ঋণ কার্যক্রমের সকল সমিতিতে প্রচারণা চালানো হয়। প্রতিটি ক্যাম্পে আশানুরূপ রোগীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। এরিয়া ভিত্তিক রোগীর উপস্থিতি নিম্নরূপ।

ক্রমিক নং	এরিয়ার নাম	জেলার নাম	রোগীর সংখ্যা			
			নারী	শিশু	পুরুষ	মোট
০১	ভোলাহাট	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৯৪	৪৯	১৬	১৫৯
০২	সৈয়দপুর	নীলফামারী	১৩২	৫২	৪৪	২২৮
০৩	মান্দা	নওগাঁ	১২৮	৫৯	১৬	২০৩
০৪	মোহনপুর	রাজশাহী	১৪৩	৭৪	০	২১৭
০৫	কালিয়াকৈর	গাজীপুর	৫৪	৫৮	১৯	১৩১
০৬	সাভার	ঢাকা	৬৫	৫৫	০	১২০
০৭	সিংগাইর	মানিকগঞ্জ	১০৯	৪৩	০	১৫২
০৮	বন্দর	নারায়ণগঞ্জ	১২২	৪৫	১৫	১৮২
০৯	সোনারগাঁ	নারায়ণগঞ্জ	১০৮	৪১	৩৩	১৮২
১০	মাধবদী	নরসিংদী	৫২	২১	৭	৮০
১১	সরাইল	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১০৫	৩০	৫	১৪০
১২	লাকসাম	কুমিল্লা	৬২	২৫	২২	১০৯
১৩	সীতাকুন্ড	চট্টগ্রাম	৮৯	৫৯	১০	১৫৮
১৪	চকরিয়া	কক্সবাজার	৪০	৩৭	২৫	১০২
১৫	হোমনা	কুমিল্লা	৯৫	১০	১৫	১২০
১৬	বানেশ্বর	রাজশাহী	৭৫	৭২	০	১৪৭
	মোট		১,৪৭৩	৭৩০	২২৭	২,৪৩০

প্রতিবেদক,
খন্দোকার হাসান আল বান্না
উপ-পরিচালক, মাইক্রোফাইন্যান্স, ভার্ক।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও ভার্কের অংশীদারিত্বে CREA প্রকল্পের সূচনা

ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত রাঙ্গাবালী উপজেলার জলবায়ু ও পরিবেশগত ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় এলাকায় "Community-based Resilience, Women's Empowerment and Action (CREA)" শীর্ষক প্রকল্প মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে বাস্তবায়ন শুরু করেছে যার মেয়াদকাল মার্চ ২০২৩ থেকে জুন ২০২৬ পর্যন্ত। রাঙ্গাবালী উপজেলার দুইটি অত্যন্ত বিপদাপন্ন ও প্রত্যন্ত ইউনিয়ন ছোটবাইশদিয়া ও রাঙ্গাবালী সদরে প্রকল্পের কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করা হবে। যেখানে এলাকার নারী ও কিশোরীরা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক শোষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত কারণে বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার। এই প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় নারী নেতৃত্বের বিকাশ, ক্ষমতায়ন এবং সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কমিউনিটিগুলোর স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করা।

প্রসঙ্গঃ জ্বালানী সাশ্রয় প্রকল্প

মোঃ ইয়াকুব হোসেন

জ্বালানী সংকটের ভয়াবহতা অনুধাবন করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা জ্বালানী গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১৯৮৭-৮৮ কর্ম বৎসরে তিনটি উপজেলায় প্রাথমিকভাবে 'জ্বালানী সাশ্রয় প্রকল্প' চালু করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জ্বালানী গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তিনটি প্রযুক্তি ক. উন্নত চুলা, খ. উন্নত কুপি এবং গ. জৈব গ্যাস প্লান্ট-এর সম্প্রসারণ কাজ চালু করা হয়। এই সম্প্রসারণের মূল লক্ষ্য হলো দেশকে ভয়াবহ জ্বালানী সংকট ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা থেকে রক্ষা করা।

এই প্রযুক্তিগুলির জনপ্রিয়তা বাড়ানো এবং এর সম্প্রসারণের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় দেশের তিনটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (এন.জি.ও)-কে দায়িত্ব দেয়। এই তিনটি এন.জি.ও দেশের তিনটি উপজেলায় এই কাজ শুরু করে।

পল্লী সম্পদ ব্যবহার শিক্ষা কেন্দ্র (ভি.ই.আর.সি) খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলায় এই কার্যক্রম শুরু করে। প্রকল্প প্রস্তাবনায় ভি.ই.আর.সি-কে উল্লেখিত বৎসরের জন্য সম্প্রসারণের লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এই লক্ষ্যমাত্রা হলো- ক. উন্নত চুলা-৫০০০টি, খ. কুপি-৫০০০টি এবং গ. জৈব গ্যাস প্লান্ট-২০টি।

পল্লী সম্পদ ব্যবহার শিক্ষা কেন্দ্র (ভি.ই.আর.সি) প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে সম্প্রসারণ কাজ দ্রুত চালিয়ে যাচ্ছে।

১। **প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ:** প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ মে '৮৭ মাসের ২৮ তারিখ থেকে জুন '৮৭ মাসের ১৬ তারিখ পর্যন্ত মোট ২১ দিনে সম্পন্ন হয়। এই প্রশিক্ষণে তেরখাদা উপজেলা থেকে মোট ১০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ভি.ই.আর.সি নিজ খরচে কাজের সুবিধার জন্য আরও ২জন মোট ১২ জনকে প্রশিক্ষণের জন্য জ্বালানী গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে পাঠায়। এই প্রশিক্ষণার্থীগণ অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে এই প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে। তাদের এই কৃতিত্বের কথা আই.এফ.আর. ডির পরিচালক সমাপনী অনুষ্ঠানে বার বার উল্লেখ করেন। এই প্রশিক্ষণার্থীগণই ১৯৮৮-১৯৮৯ ও ১৯৮৯-১৯৯০ সালে দেশের অন্যান্য উপজেলায় প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করবে।

২। **মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ:** প্রশিক্ষকগণ তাদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে নিজ নিজ কর্ম এলাকায় চলে যায়। তেরখাদা উপজেলা মোট ৬টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। এই ৬টি ইউনিয়ন থেকে উৎসাহী মাঠ পর্যায়ের কর্মী বাছাই করা

হয়। এই কর্মীগণই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত তরান্বিত করবে। এ পর্যন্ত মোট ২১০ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মীকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এই প্রশিক্ষণ ইউনিয়নভিত্তিক সমাপ্ত করা হয়।

৩। **প্রযুক্তির প্রচার:** নিম্নে উল্লেখিত মাধ্যমে প্রযুক্তির প্রচার কাজ চালানো হচ্ছে-

ক) **ব্যক্তিগত যোগাযোগ:** প্রশিক্ষকগণ ও মাঠ পর্যায়ের কর্মীগণ নিজ নিজ এলাকায় ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রযুক্তির গুণাগুণ জনগণের মাঝে বর্ণনা করছে।

খ) **মাইকিং:** উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে, স্কুলে, হাট ও বাজারে মাইকিং-এর মাধ্যমে প্রযুক্তির গুণাগুণ এবং এর প্রাপ্তির উপায় উল্লেখ করা হচ্ছে।

গ) **পোস্টার:** উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে ও গ্রামে গ্রামে পোস্টার-এর মাধ্যমে এই প্রযুক্তির উপকারিতা জনগণের মাঝে পৌঁছে দেয়া।

ঘ) **প্রযুক্তি প্রদর্শনী:** উপজেলা কমপ্লেক্সে জনসমক্ষে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রতিদিন শত শত লোক এই প্রযুক্তি প্রদর্শন করছে। এ ব্যাপারে উপজেলা কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। প্রশিক্ষণের জন্য উপজেলা চেয়ারম্যান উপজেলা অডিটরিয়ামের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। উন্নত চুলা এবং সনাতনী চুলার পার্থক্য করার জন্য এক রান্নার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসারসহ বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত থেকে উন্নত চুলার কার্যকারিতা দেখে তারা মুগ্ধ হন। এছাড়া হাটে ও বাজারে বেশ কিছু চুলা প্রদর্শনীর জন্য স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে।

৪। **অর্জিত ফলাফল:** প্রশিক্ষকগণ ও মাঠ পর্যায়ের সম্প্রসারণ কর্মীগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই চুলা তৈরি করে দিচ্ছে। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মীদের সাথে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। হাটে ও বাজারে মাইকিং-এর সাহায্যে কুপির গুণাগুণ বর্ণনা করে এই কুপি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়া জনগণ নির্দিষ্ট প্রাপ্তিস্থান থেকেও এই কুপি কিনে নিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত অর্জিত ফলাফল নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

ক) উন্নত চুলা : ৪২৫৬টি তৈরি করা হয়েছে।

খ) উন্নত চুলা : ৩০০০টি বিক্রি করা হয়েছে।

গ) জৈব গ্যাস প্লান্ট : এ পর্যন্ত জৈব গ্যাস প্ল্যান্ট তৈরি হয়েছে ৭টি।

৫। **সমস্যা :** এ পর্যন্ত অর্জিত ফলাফলে পৌঁছুতে গিয়ে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অতি বৃষ্টির ও বন্যার জন্য মাঠ ঘাট ডুবে গেছে। যার ফলে উন্নত চুলা তৈরির জন্য উপযুক্ত মাটির অভাব দেখা দিয়েছে। এটি একটি বাস্তব সমস্যা। প্রকল্প চালুর সময় থেকে এ পর্যন্ত অতি বৃষ্টির জন্য তৈরিকৃত চুলা শুকানো যাচ্ছে না, যার ফলে ঐ চুলাগুলি ব্যবহারের উপযোগী ও হচ্ছে না। এ ছাড়া অতি বৃষ্টির জন্য সম্প্রসারণ কর্মীগণ গ্রামে গ্রামে চলাফেরা করতে পারছে না। এক সাথে বিপুল পরিমাণ কুপি তৈরির প্রস্তাব পেয়ে সরবরাহকারীগণ ঠিক সময়মত কুপি সরবরাহ করতে পারছে না বলে কুপি বিক্রি ও সম্প্রসারণ কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

৬। **প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সীমা:** যে হারে সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে তাতে আশা করা যায় আগামী সেপ্টেম্বর '৮৯ সালের মধ্যে প্রকল্পে উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। তবে জৈব গ্যাস প্লান্ট স্থাপনের বেশ কিছু জটিলতা রয়েছে।

লোক সংখ্যার আধিক্যহেতু বাংলাদেশে বনসম্পদ উজার হয়ে যাচ্ছে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ ভারসাম্যহীনতার সম্মুখীন হচ্ছে। দেশের বেশ কিছু এলাকায় মরুবরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি রোধকল্পে জ্বালানী সাশ্রয় প্রকল্প এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এই প্রকল্পে তৈরি উন্নতমানের চুলা ব্যবহার করে প্রতিবৎসর প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা মূল্যের জ্বালানী বেঁচে যাবে – যা আসে মূলত: আমাদের বন সম্পদ উজার করে। হারিকেনের বিকল্প হিসেবে উন্নত কুপি ব্যবহার করলে দেশের কেরোসিনের সংকট বহুলাংশে নিরসন হবে এবং প্রতি বৎসর প্রায় ১৬০ কোটি টাকার মূল্যের কেরোসিন সাশ্রয় হবে।

আমাদের দেশকে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এ প্রকল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

দেশে খর্বাকৃতির শিশু বাড়ছে

পুষ্টি নিরাপত্তা

জিংকসহ অন্যান্য ভিটামিন ও পুষ্টির অভাবে শিশুরা খর্বাকৃতির হচ্ছে এবং অপুষ্টিজনিত নানা সমস্যায় ভুগছে। চালের মাধ্যমে এ অপুষ্টি দূর করা যাবে।

করোনা মহামারি ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাবসহ নানা কারণেই দেশে খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে। ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়ায় মানুষ অপেক্ষাকৃত কম দামের চাল ও দানাদার খাবার বেশি খাচ্ছে। এতে পেট ভরলেও অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তাই পুষ্টিকর খাবার ও জিংকসমৃদ্ধ ভাত খাওয়া বাড়াতে হবে।

রাজধানীর একটি হোটেলে 'বায়োফর্টিফাইড জিংক রাইস সম্প্রসারণের মাধ্যমে অপুষ্টি দূরীকরণে সম্ভাব্যতা ও করণীয়' শীর্ষক এক সংলাপে বক্তারা এসব কথা বলেন। গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন (গেইন) আয়োজিত এ সংলাপে দেশের কৃষি ও পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন।

সংলাপে উপস্থাপন করা মূল প্রবন্ধে গেইন বাংলাদেশের কান্ট্রি লিড আশেক মাহফুজ বলেন, দেশের বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষ অর্থসংকটের কারণে পুষ্টিকর অন্যান্য খাবার না পেয়ে তিন বেলা ভাত খেয়ে টিকে আছে। ফলে প্রায় ৫৩ শতাংশ শিশু ভিটামিন এ, ৩২ দশমিক ৫ শতাংশ জিংক, ২৬ শতাংশ ভিটামিন ডি, ২২ দশমিক ৩ শতাংশ রক্তস্বল্পতা ও ২০ শতাংশ আয়োডিনের অভাবে ভুগছে।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, দেশের প্রায় ৫৫ শতাংশ অর্থাৎ ৯ কোটি ৫০ লাখ মানুষের শরীরে জিংকের অভাব রয়েছে। ৩৫ লাখ প্রাক্-স্কুলবয়সী শিশু ও ২ কোটি নারী জিংকের ঘাটতিতে ভুগছেন। যে কারণে শিশুরা খর্বাকৃতির হয়ে যাচ্ছে ও প্রায়ই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে।

সংলাপে বক্তারা বলেন, জিংকসহ অন্যান্য ভিটামিন ও পুষ্টির অভাবে শিশুরা খর্বাকৃতির হচ্ছে ও অপুষ্টিজনিত নানা সমস্যায় ভুগছে। চালের মাধ্যমে এ অপুষ্টি দূর করা যাবে। কারণ, মোট চাহিদার প্রায় ৭০ শতাংশ পুষ্টি চালে পাওয়া সম্ভব। তাই জিংকসমৃদ্ধ চালের উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি এ চাল জনপ্রিয় করতে হবে।

প্রধান অতিথি কৃষিমন্ত্রী মো: আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'আমি গ্রামে গেলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গিয়ে যেসব শিশুকে দেখি, তাদের বেশির ভাগই খর্বাকৃতি ও অপুষ্টিতে ভুগছে। একসময় আমরা জাপানিদের খাটো বলতাম। এখন আমরা খাটো হয়ে যাচ্ছি। জাতি হিসেবে এটা আমাদের জন্য দুঃখজনক। নারী ও শিশুদের মধ্যে জিংকের ঘাটতি আতঙ্কজনক পর্যায়ে চলে গেছে।'

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (BRRI) মহাপরিচালক মো: শাহজাহান কবির বলেন, ২০১৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত সাতটি জিংক সমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে BRRI। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) জিংক সমৃদ্ধ উচ্চফলনশীল আমনের একটি জাত 'বিনা ধান-২০' উদ্ভাবন করেছে।

সূত্র: প্রথম আলো
প্রকাশ: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বিশ্বে নিরাপদ সুপেয় পানি পাচ্ছেন না ২৬% মানুষ : জাতিসংঘ

প্রথম আলো, ২২ *মার্চ* ২০২৩

বিশ্বজুড়ে পানির অপচয় রোধের আহ্বান জানিয়ে এক প্রতিবেদনে জাতিসংঘ জানিয়েছে, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২৬ শতাংশ এখন পর্যন্ত নিরাপদ সুপেয় পানির সুবিধা থেকে বঞ্চিত; আর মৌলিক পয়ঃনিষ্কাশন জন্য নিয়মিত পানির নিশ্চয়তা নেই শতকরা হিসেবে এমন মানুষের হার ৪৬ শতাংশ।

সংখ্যার হিসেবে বর্তমানে বিশ্বে ২০০ কোটিরও বেশি মানুষের নিরাপদ সুপেয় পানির নিশ্চয়তা নেই, আর পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য নিয়মিত পানির সুবিধা নেই ৩৬০ কোটিরও বেশি মানুষের।

২২ তারিখ আন্তর্জাতিক পানি দিবস। পানির অপচয় রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রায় ৫ দশক আগে এই দিনটিকে 'পানি দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে জাতিসংঘ।

তবে সম্প্রতি এই ইস্যুতে জাতিসংঘ আরও বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে। চলতি বছর পানি দিবসে বিশ্বের বৃহত্তম এই আয়োজনঃ রাষ্ট্রীয় সংস্থার উদ্যোগে এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অংশগ্রহণে বড় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পানি নিয়ে এই প্রথম এত বৃহৎ আকারের সম্মেলনের আয়োজন করেছে জাতিসংঘ।

সম্মেলনে জাতিসংঘের প্রতিবেদনটি পাঠ করা হয়। সেখানে আরও বলা হয়, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের সব মানুষের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় পানির নিশ্চয়তা চায় জাতিসংঘ।

প্রতিবেদনের প্রধান সম্পাদক রিচার্ড ক'নর এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, জাতিসংঘ যে লক্ষ্য নিয়েছে, তা পূরণ করতে হলে এখন থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ব্যয় করতে হবে ৬০ হাজার কোটি থেকে ১ লক্ষ কোটি ডলার।

এই প্রকল্পকে এগিয়ে নিতে এবং জাতিসংঘকে সহায়তা করতে বিনিয়োগকারী, ধনী ব্যক্তিবর্গ ও সদস্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন রিচার্ড ক'নর।

জাতিসংঘের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৪০ বছর ধরে প্রতি বছর বিশ্বে পানি ব্যবহারের পরিমাণ বাড়ছে ১ শতাংশ করে এবং বর্তমানে বিশ্বজুড়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে হার, তাতে আগামী ২০৫০ সাল পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

সংবাদ সম্মেলনে রিচার্ড ক'নর বলেন, পানির ব্যবহার মূলত বাড়ছে উন্নয়নশীল ও উদীয়মান অর্থনীতির বিভিন্ন দেশের কারণে। প্রতি বছর এসব দেশে একদিকে যেমন বাড়ছে কৃষি ও শিল্পোৎপাদন, তেমনি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জনসংখ্যাও।

এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণেও পানির ওপর চাপ বাড়ছে বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘের এই কর্মকর্তা।

'জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে গত কয়েক বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনেক কৃষি অঞ্চল খরাপ্রবণ হয়ে উঠছে। ফলে উৎপাদন চালু রাখতে সেচের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে কৃষকদের। এই মুহূর্তে বিশ্বের স্বাদু পানির ৭০ শতাংশই ব্যবহার হচ্ছে কৃষিখাতে, সংবাদ সম্মেলনে বলেন রিচার্ড ক'নর।

পানির অপচয় রোধে ব্যবহৃত পানি পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন জাতিসংঘের কর্মকর্তা। তিনি বলেন, 'ব্যবহৃত পানি পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলার মাধ্যমে অপচয় ব্যাপকভাবে রোধ করা সম্ভব। প্রতিদিন বিশ্বজুড়ে ৮০ শতাংশ ব্যবহৃত পানি অপচয় হচ্ছে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর বেলায় এই হার প্রায় ৯৯ শতাংশ'।

বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ক্যামেরা দ্য মিনিকা

বর্তমানে স্মার্টফোন মানবজীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। ছবি তোলা থেকে শুরু করে যেকোনো কাজে সেলফোন ব্যবহার হয়। অনেকের মতে স্মার্টফোনই হচ্ছে সহজে বহনযোগ্য ক্যামেরা। তবে সবচেয়ে ছোট ও হালকা ওজনের ক্যামেরা যে স্মার্টফোন নয়, সেটিও এখন সামনে এসেছে।

বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ও হালকা ওজনের ক্যামেরার খেতাব পেয়েছে মিনিকা। এর আকৃতি এয়ারপডের সমান। মিনিকার ওজন মাত্র ১৭ গ্রাম। তবে সাধারণ ক্যামেরার মতো সবকিছুই এতে রয়েছে।

মিনিকায় দশমিক ৯৬ ইঞ্চির ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে। ছবি ও ভিডিও ধারণের আগে এখানে দেখা যাবে। এ ক্যামেরার মাধ্যমে ১৯২০X১০৮০ পিক্সেলে ভিডিও এবং ৩৭৬০X২১২৮ রেজুলেশনে ছবি তোলা যাবে।

বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ও হালকা ক্যামেরায় ১৮০ মিলি অ্যাম্পিয়ার আওয়ারের ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে, যা একবারের চার্জে ৬০ মিনিট পর্যন্ত চলবে। এর সঙ্গে মাইক্রোএসডি কার্ড রিডারও রয়েছে, যেটিতে সহজে কম্পিউটারের ছবি ও ভিডিও স্থানান্তর করা যাবে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে ডিভাইসটির বিক্রি শুরু হয়নি।

সূত্র: ওয়েবসাইট

সরকারি কর্মকর্তাদের সম্বোধনে শুধুই ‘স্যার’ বলা কতটা ন্যায্য

একদিন পরিচালকের পিয়ন এসে ইশারায় ডাকেন, ‘আপনের ফোন’। পরিচালকের কক্ষে কেউ একজন ফোন করে আমাকে চাইছেন। হাতের ফোনটা কোনোমতে রেখে পড়িমরি করে সিঁড়ি ভেঙে পরিচালকের কক্ষে গেলাম। টেবিলের ওপর রাখা ফোনটা হাতে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলি, ‘আসসালামু আলাইকুম, জি ভাই বলেন।’ ওপার থেকে জবাব আসে, ‘ভাই না, ভাই না, আমি জয়েন্ট সেক্রেটারি...’।

সংবিধান অনুযায়ী, সব সময়ে জনগণের সেবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। তাই জনগণকে ‘স্যার’ সম্বোধনে বাধ্য করা কতটা যৌক্তিক।

গওহার নঈম ওয়ারা
লেখক ও গবেষক
প্রকাশ: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
প্রথম আলো

১৯৮৮ সালের কথা। বন্যায় সারা দেশ ডুবছে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) কর্মীরা রাতদিন কাজ করছেন। তখন মুঠোফোন, ফ্যাক্স কিছুই ছিল না। আমাদের অফিসের টেলিপ্রিন্টারটি ছিল দেশের সব এনজিওর সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। আমরা ঘুমালে ইউরোপ-আমেরিকা জাগে। তাই সারা রাত চলত টেলিপ্রিন্টার।

এনজিওগুলোর বিদেশি বরাদ্দ এলে তা ছাড় করাতে হতো মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব কমিটি থেকে। নিয়ন্ত্রণকক্ষে ফোনের পর ফোন। সভার পর সভা। প্রেস নোট। সশরীরে আসা সংবাদকর্মীদের প্রশ্নের উত্তর। নিয়ন্ত্রণকক্ষের দুটি ফোনই সব সময় ব্যস্ত। একদিন পরিচালকের পিয়ন এসে ইশারায় ডাকেন, ‘আপনের ফোন’। পরিচালকের কক্ষে কেউ একজন ফোন করে আমাকে চাইছেন। হাতের ফোনটা কোনোমতে রেখে পড়িমরি করে সিঁড়ি ভেঙে পরিচালকের কক্ষে গেলাম। টেবিলের ওপর রাখা ফোনটা হাতে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলি, ‘আসসালামু আলাইকুম, জি ভাই বলেন।’ ওপার থেকে জবাব আসে, ‘ভাই না, ভাই না, আমি জয়েন্ট সেক্রেটারি...’। তখন সদ্য সরকারি চাকরি ছেড়ে, ‘স্যার কালচার’ ছেড়ে ‘ভাই কালচারে’ যোগ দিয়েছি। ফলে বিস্মিত হলেও খুব বেশি চমকাইনি।

‘ভাই’ বলে সম্বোধন করায় এবার চটেছেন একজন এসি ল্যান্ড (সহকারী কমিশনার, ভূমি)। দেশের যেসব জেলায় পদায়ন দেওয়ার আগে আমলাদের ঠিকুজি বিশেষভাবে নিরীক্ষা করা হয়, সে রকম একটি জেলার সদর উপজেলার এসি ল্যান্ড তিনি। ধারণা করা যায়, বিশেষ বাছাইয়ে এগিয়ে থাকা কর্মকর্তাদের মধ্যে সর্বগুণে গুণান্বিত তিনি। এমনই একজন চৌকস কর্তাকে একজন সংবাদকর্মী একটি প্রতিবেদনের জন্য আদব লেহাজ মেনে তাঁর একটা বক্তব্য চেয়েছিলেন ফোনে। জমি সংক্রান্ত প্রতিবেদনে ‘এসি ল্যান্ডের’ একটা বক্তব্য নেওয়ার রেওয়াজ থেকেই বোধ করি এ প্রচেষ্টা। যথারীতি সালাম দিয়ে ওই সংবাদকর্মী বলেছিলেন, ‘ভাই যে বিষয়ে ফোন দিয়েছি...।’ সংবাদকর্মীকে আর এগোতে দেননি এসি ল্যান্ড। ওখানেই থামিয়ে দিয়ে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, ‘আগে বলেন, আপনি এসি ল্যান্ডকে ভাই কেন বলছেন। আমি আপনার কেমন ভাই?’

এমন প্রশ্নের জন্য মনে হয় তৈরি ছিলেন না সংবাদকর্মী। তিনি বিনয়ের সঙ্গে জানতে চেয়েছিলেন তাহলে কীভাবে সম্বোধন করব আপনাকে? ‘স্যার’ বলব কি? বিরক্ত এসি ল্যান্ড তাঁকে জানিয়ে দেন, ‘আপনার ভাব বেশি। আপনার স্যার ডাকতে হবে না। কিন্তু কখনোই ভাই ডাকবেন না। এটা ফরমাল কোনো ডেকোরাম না।’ মহাবিপদ! ভাইও নয়, স্যারও নয়। তবে কী?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছড়ার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল স্কুলে ভর্তির অনেক আগেই। কিন্তু তাঁর ছররা মার্কা ছড়ার সঙ্গে পরিচয় হয় ষষ্ঠ শ্রেণিতে। পন্ডিত স্যার একদিন ভাবসম্প্রসারণের জন্য বেছে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই পঙ্‌ক্তি-

কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে,
ভাই ব’লে ডাক যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরোসিন বলি উঠে, এসো মোর দাদা।...

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়

ভাই বলে সম্বোধনে আমলাদের আপত্তি, বিরক্তি, অস্বস্তি, উষ্মা প্রকাশ নতুন কিছু নয়। সম্ভবত ২০২০ সালের অক্টোবরে সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ঠিক একইভাবে সাবধান করে দিয়েছিলেন এক ব্যক্তিকে। সে সময় এ ঘটনার খবর গণমাধ্যমে এসেছিল। ওই ব্যক্তি ইউএনওর আপত্তির মুখে ভ্যাবাচেকা খেয়ে বলেছিলেন, 'আমি তো ডিসি সাহেবকেও ভাই বলি।' এতে আরও তেঁতে উঠে ইউএনও বলেন, 'ডিসি সাহেবকে ডাকছেন ডাকেন। কিন্তু আমাকে ভাই ডাকা যাবে না।' দিরাইয়ের এ ঘটনা সম্পর্কে তখন একটি অনলাইন পোর্টালে খবরের নিচে আহমদ আনিসুর রহমান নামের এক ব্যক্তি মন্তব্য করেছিলেন, তিনি সরকারি চাকরির পদ কীভাবে পেলেন? বিষয়টি নিয়ে সে সময় বেশ শোরগোল হয়েছিল। ব্যতিক্রম ছিলেন আবদুল আহাদ। তিনি তখন সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক। ঘটনাটি অবহিত করে বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, 'আমি তো সাংবাদিকদের সহকর্মীই মনে করি। আমরা তো কাউকে বলতে পারি না, আমাকে স্যার ডাকেন। এটা নিয়মের মধ্যেও পড়ে না।'

সম্বোধন নিয়ে আপত্তির মধ্যে জনগণ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে 'স্যার নাকি ভাই' কী বলে ডাকবে জানতে চেয়ে সেবার তথ্য অধিকার আইনে সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত আবেদন করেন একজন উন্নয়নকর্মী। তার জবাবে বলা হয়, 'সম্বোধন সংক্রান্ত কোনো আইন বা বিধি জেলা প্রশাসকের দপ্তরে নেই।' জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ইকবাল মাহমুদ তখন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান। 'স্যার না ভাই নাকি অন্য কিছু' বিতর্কের দিকে ইঙ্গিত করে দুদক কার্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমরা চাই প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা সেবাগ্রহীতা নাগরিকদের "স্যার" সম্বোধন করবেন, নাগরিকেরা নয়।'

সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার এ বিষয়ে খুব স্পষ্ট করে বলেছিলেন, বিদেশে সরকারি কর্মকর্তা ও মন্ত্রীদের নাম ধরে ডাকে (নাগরিকেরা)। এ দেশেও এ সংস্কৃতি শুরু করে সবাইকে নাম ধরে ডাকা উচিত। এটাই আন্তর্জাতিক চর্চা। এটা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। তবেই এ সমস্যার সমাধান হবে। সন্দেহ নেই, মজুমদার সাহেবের বক্তব্য বিপ্লবী, কিন্তু সেটাই ভবিতব্য।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বছরখানেক আগে বলেছিলেন, 'আমাদের তো একটা ক্লিয়ার মেসেজ গেছে। আমি বলে দিয়েছি, স্যার বা ম্যাডাম বলার কোনো বিধান নেই। কোনো আইনে নেই যে তাকে এটা বলতে হবে। আমাদের জনগণের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। জনগণের সঙ্গে মিশে যেতে হলে কেউ যদি ভাই বলে, রাগ করার তো কিছু নেই। আমার কাজটা হচ্ছে আপনাকে সার্ভিস দেওয়া।'

সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার এ বিষয়ে খুব স্পষ্ট করে বলেছিলেন, বিদেশে সরকারি কর্মকর্তা ও মন্ত্রীদের নাম ধরে ডাকে (নাগরিকেরা)। এ দেশেও এ সংস্কৃতি শুরু করে সবাইকে নাম ধরে ডাকা উচিত। এটাই আন্তর্জাতিক চর্চা। এটা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। তবেই এ সমস্যার সমাধান হবে। সন্দেহ নেই, মজুমদার সাহেবের বক্তব্য বিপ্লবী, কিন্তু সেটাই ভবিতব্য।

তবে 'ভবী ভুলিবার নয়'

এত মতামত, ইঙ্গিত, বাণী দেওয়ার পরও 'সালিস মানি, কিন্তু তাল গাছটা আমার' মনোভাবে কোনো ছেদ বা বিরামচিহ্ন পড়েনি। 'স্যার' সম্বোধন আদায়ের জন্য ছোটবড় নারী পুরুষ নির্বিশেষে আমলাদের ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে উঠতে দেখা যায়। বিষয়টি বিস্ময়করভাবে ছোঁয়াচে হয়ে উঠছে। প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে 'স্যার' প্রীতি নিয়ে আগে খবরাখবর প্রকাশিত হতো। এখন অন্য ক্যাডারের মধ্যেও সেটা সংক্রমিত হয়েছে। সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দায়িত্বরত একজন চিকিৎসককে 'স্যার' না ডেকে 'দাদা' ডাকায় একজন স্ট্রোকের রোগীকে চিকিৎসা না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। চিকিৎসার অভাবে রোগী মারা গেছেন বলেও দাবি করেন তাঁর স্বজনেরা। এ ঘটনা ২০২১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি।

উদাহরণ আরও আছে। যশোরের একটি উপজেলায় একজন কৃষি কর্মকর্তাকে 'স্যার' বলে সম্বোধন না করায় ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি অফিস থেকে চার সাংবাদিককে বের করে দিয়েছিলেন বছর কয়েক আগে।

বিদ্যুৎ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীদের নাম এসেছে 'স্যার' ডাকের জন্য কাতরদের তালিকায়। একটি দৈনিক পত্রিকার ময়মনসিংহের একটি উপজেলার এক প্রতিনিধি ফোন করেছিলেন বিদ্যুৎ বিভাগের এক নির্বাহী প্রকৌশলীকে। তাঁকে 'ভাই' বলে সম্বোধন করায় ওই প্রকৌশলী ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, 'আমাকে "স্যার" সম্বোধন করে কথা বলুন, আমি ডিসির সমমান। আমার সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন, আমি ডিসির সমমান পদমর্যাদায় আছি। আমি ২০তম বিসিএসে ক্যাডার হিসেবে যোগদান করার পর পঞ্চম গ্রেডে কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছি। আমাকে আগে "স্যার" বলে সম্বোধন করে, পরে কথা বলুন।'

কেমন করে ভিত গাড়ল 'স্যার কালচার'

ব্রিটিশরা এ দেশে আমলাতন্ত্রের ভিত গাড়ার আগে এ দেশে প্রশাসন ছিল। তখন পদের নামেই সম্বোধন চলত। রাজা, কাজি, আমিন, তালুকদার, জায়গিরদারদের পদ বা কখনো কখনো বাদশার কাছ থেকে পাওয়া উপাধি বা পদবি দিয়েও সম্বোধন চলত। ব্রিটিশরা নিজের দেশে নাম বা পদ ধরে সম্বোধনের রেওয়াজ চালু রাখলেও উপনিবেশের বাসিন্দাদের প্রভু মানে 'স্যার' সম্বোধন শিখিয়েছেন। আইসিএস কর্মকর্তা অশোক মিত্র ছিলেন ভারতের প্রথম জনগণনা কমিশনার। সমাজবিজ্ঞানী, গবেষক, প্রাবন্ধিক, শিল্প ঐতিহাসিক ও শিল্প সমালোচক হিসেবেও তাঁর সুনাম ছিল। তিনি বিলেতের প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে তাঁর সিনিয়র 'ব্রিটিশ বস' বা বড়কর্তাকে সালাম দিতে গিয়েছিলেন। অশোক মিত্র, স্যার না বলে তাঁর পদ ধরে সম্বোধন করেছিলেন। এ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে অশোক মিত্র লিখেছেন, 'খেয়াল করলাম, তাঁর ভ্রুটা একটু কুঁচকে গেল যেন। তিনি নেটিভ ভারতীয়র কাছে একজন ব্রিটিশ প্রভু হিসেবে 'ইউর অনার' বা সম্মানসূচক সম্বোধন আশা করেছিলেন।'

ব্রিটিশরা চলে গেছে, কিন্তু তাদের কুঁচকানো ভ্রুটা রয়ে গেছে। কালে কালে 'স্যারের' শিকড়টা এমন গভীরে চলে গেছে যে এখন বড় কর্তার সব কথার উত্তর 'স্যার' শব্দ দিয়েই দেওয়া যায়। হ্যাঁ বাচক, না বাচক যাই হোক এক 'স্যার' দিয়ে সেরে ফেলা যায় কথোপকথন।

ব্রিটিশরা চলে গেছে, কিন্তু তাদের কুঁচকানো ভ্রুটা রয়ে গেছে। কালে কালে 'স্যারের' শিকড়টা এমন গভীরে চলে গেছে যে এখন বড় কর্তার সব কথার উত্তর 'স্যার' শব্দ দিয়েই দেওয়া যায়। হ্যাঁ বাচক, না বাচক যাই হোক এক 'স্যার' দিয়ে সেরে ফেলা যায় কথোপকথন।

অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে করেন, নড়বড়ে আত্মবিশ্বাস নিয়ে চলা মানুষের মধ্যে পোশাকি আড়ম্বরের প্রতি একটা ঝোঁক থাকে। যে শিক্ষক ভালো পড়াতে পারেন না, ক্লাসকে আকর্ষণীয় করতে পারেন না, তিনি মারপিট, বকাবকি, হুমকি দিয়ে ক্লাস শান্ত রাখার নিষ্ফল চেষ্টা করেন। কোন ছাত্র কতটা ঝুঁকে সালাম দিল, আর কে দিল না, সেটাই হয়ে ওঠে তাঁর প্রধান বিবেচ্য বিষয়। দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল যেমন বলেছেন, 'ক্ষমতার অপব্যবহারের মধ্যেই দুর্বল মানুষ ক্ষমতার স্বাদ পেতে চায়।'

উত্তরণের উপায় কী

এ প্রশ্নের সহজ কোনো উত্তর নেই। নতুন কিছু শেখানোর আগে ভোলাতে (ডি-লার্নিং) হবে অনেক কিছু। পাবনার একটি উপজেলার একজন ইউএনও নাকি বলেছেন, 'আপনি জানেন না একজন ইউএনওকে "স্যার" বা "ম্যাডাম" বলতে হয়। আমাদের চাকরিতে নিয়মকানুন আছে। অবশ্যই আমাকে "স্যার" বা "ম্যাডাম" বলে সম্বোধন করতে হবে। অন্য কারোর সঙ্গে আমাকে বিবেচনা করা যাবে না।' হয়তো তিনি সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কথাটা বলেছেন। আবার হয়তো তিনি এটা বিশ্বাসও করেন। অনেকে মনে করেন, 'স্যার' শব্দে সরকারি কর্মকর্তাদের আত্মপ্রত্যয় বেড়ে যায়। আত্মপ্রত্যয় কি একটি শব্দের মধ্যে লুকিয়ে থাকে? ওটা জপ করলেই সেখান থেকে প্রত্যয় ভুরভুর করে বেরিয়ে আসবে?

সরকারি কর্মকর্তাদের বনিয়াদি প্রশিক্ষণের সময় এখন বেড়েছে। সেখানে স্বাধীন দেশের জনগণের সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের কর্মীদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত, সেটা নিয়ে বিস্তারিত ও হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। বার্ষিক মূল্যায়নে স্থানীয় জনগণের একটা হিস্যা থাকা উচিত।

বিশেজ্ঞরা মনে করেন, প্রশাসনের ভেতরে ঊর্ধ্বতন ও অধস্তনদের মধ্যে প্রভু ও দাস মার্কা সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেওয়া ঠিক নয়। অর্থাৎ প্রশাসনের ভেতরেই একে অপরের প্রতি আচরণবিধিতে একটা গুণগত পরিবর্তন আনা দরকার।

বাংলাদেশে সরকারি কর্মচারীদের জন্য একটি আচরণ বিধিমালা আছে। প্রায় ৪০ বছর আগের এই আচরণবিধি অবশ্য ২০০২

সালে ও ২০১১ সালে দুই দফায় সংশোধিত হয়েছে। এখানে মোট ৩৪টি নির্দেশনা থাকলেও নাগরিকদের সঙ্গে আচরণ বিষয়ে আলাদা কোনো বিধি নেই।

অবশ্য ২০১৮ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালায় নাগরিকদের সঙ্গে যেকোনো অসদাচরণ শাস্তিযোগ্য হবে, এমনটি লেখা আছে। সেখানে অসদাচরণ বলতে বোঝানো হয়েছে, অসংগত আচরণ, চাকরি-শৃঙ্খলা হানিকর আচরণ কিংবা শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণকে। তবে এসবের বিস্তারিত আলোচনা সেখানে নেই।

ভুলে গেলে চলবে না সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সব সময়ে জনগণের সেবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। তাই জনগণকে 'স্যার' সম্বোধনে বাধ্য করার বিষয়টি কতটা ন্যায্য, তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

কচি হাতের কলম থেকে

মাহ্‌দিয়া খন্দকার রাইসা
৪র্থ শ্রেণি, তুলাতলী শিখন কেন্দ্র
রায়পুরা, নরসিংদী

খুকুমনি

খুকুমনি দুপুরে
গিয়েছিল পুকুরে।

ধরতে ছিল মাছটা
আছাড় খেল পাঁচটা ।

খারাপ হলো মনটা
কাটল সারা দিনটা।

তানহা আক্তার
৩য় শ্রেণী, সবুজ দল
পুরানবাড়ি শিখন কেন্দ্র, পাঁচদোনা, নরসিংদী সদর

ইচ্ছে

ইচ্ছে করে সাঁতার কাটি
মাঝ নদীতে গিয়ে।

ইচ্ছে করে উড়াল মারি
মাঝ আকাশে গিয়ে।

ইচ্ছে করে ভালোবাসি
আমার দেশের মাটিতে।

ইচ্ছে করে ঘুরে বেড়াই
ফুল ফসলের বাটিতে।